বাংলাদেশের স্বাধীনতা: ধর্মনিরপেক্ষতার বাংলাদেশ গড়ার সংকট ও সম্ভাবনা

-----ফজলে হোসেন বাদশা

আজ ৩০ মার্চ। স্বাধীনতার মাসের আমরা আজ শেষ প্রান্তে। তাই মুক্তিযুদ্ধের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় একত্রিত হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দ্বিজাতিতত্ত্বের রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে একটা সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার সংকল্পের দিকে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে কারণেই চার মূলনীতি সংবিধানে যুক্ত করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার সেই নীতি এখন বাস্তব চর্চায় কোন স্তরে বিদ্যমান অথবা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার অগ্রগতি প্রসঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনার প্রশ্নের গুরুত্ব আছে কি না সেটাই বিবেচ্য।

এসময় নিউজিল্যান্ডে দুঃখজনক উগ্রতার ঘটনা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু সে দেশের সরকার ও রাষ্ট্র কীভাবে পুরো পরিস্থিতি সামাল দিতে ধর্মনিরপেক্ষতার এক নজির সৃষ্টি করলো। যা সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে জাগ্রত করতে কিঞ্চিৎ হলেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা না করার উপায় নেই। নিউজ উইক লিখেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন।

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, পৃথিবীর বহু দেশেই এ ধরনের নেতৃত্ব জরুরি হয়ে পড়েছে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ও আরব বিশ্বের পরিস্থিতিকেও কি আজ অবহেলা করা যায়? ইয়েমেনে মানবিক বিপর্যয় এখন চরমে। আফগানিস্তানে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রশ্ন এখন রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। ইসরাইলের গাজা দখলে এখন আরব বিশ্ব দর্শকে পরিণত হয়েছে। সৌদি আরব যখন কাতার কিংবা ইরানের বিরুদ্ধে উস্কানী দিবে, তুরস্কে খাসোগীর মতো সাংবাদিককে দূতাবাসে হত্যা করবে, তখন চুপ করে থাকা কতটা যুক্তি সংগত অথবা ইয়েমেন সহ প্রতিবেশী দেশ গুলিতে যুদ্ধ চাপিয়ে দিবে, একদিকে প্যালেষ্টাইন জনগোষ্ঠির উপর ইস্রাইলের আগ্রাসন চলতে থাকবে আর সৌদি আরব ইস্রাইলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। এবং সব চেয়ে বড় মার্কিনি অস্ত্র ক্রেতায় পরিনত হবে তখন আমরা বিষয় গুলিকে কিভাবে দেখবো। মিয়ানমারে যখন রোহিঙ্গাদের ওপর মানবিক বিপর্যয়ের ফলে ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আমাদের আশ্রয় দিতে হবে, তখন? এ সবকিছুই ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

অথচ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পথ ছিলো ভিন্ন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব বক্তব্যই আমাদের উপলব্ধির জন্য যথার্থ। বঙ্গবন্ধু সংসদে ধর্মনিরপেক্ষতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, “ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার থাকবে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মপালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আপত্তি হলো শুধু এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন-ব্যাভিচার। এই বাংলার মাটিতে এসব চলেছে। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।” এই ছিলো বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের চার মূলনীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমি যদি আমার জীবদ্দশায় চার মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে নাও পারি, মৃত্যুর পরেও যদি তা বাস্তবায়িত হয়, আমার আত্মা শান্তি পাবে।”

আমাদের সংবিধানের ২৮ (১) (২) ও ৪১ (১) (ক) (খ) বিধিতে জনগণের ধর্ম প্রশ্নে স্বাধীনতা উল্লিখিত আছে। এছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে ১২ (ক)(খ)(গ)(ঘ) ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু বাহাত্তরের সংবিধানে যখন চার মূলনীত তুলে দেয়া হয় তখন থেকে এই সাম্প্রদায়িকতা বেগবান হয়। এখন সংবিধানে চার মূলনীতি ফিরে আসলেও ৭২ এর সংবিধান থেকে বিচ্যুতি গুলি সংশোধন করা হয়নি। ফলে প্রবনতা গুলি থেকেই গেছে। সকলে একাত্রিত হয়ে এ সমস্যার সমাধান আনতে হবে। যেমন শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসকে একমুখি করার সম্ভব হয়নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষা বাস্তবে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমকি জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিও এখন প্রকাশ্যে উচ্চারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ। অথচ সব আইন প্রয়োগ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। দন্ডবিধির ২৯৫ থেকে ২৯৮ ধারায় যে ধর্মের অবমাননাকারীর সাজার কথা বলা আছে, তা মূলত ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবিধা ও সন্তুষ্টির জন্য। সংখ্যালঘুদের ধর্মের ব্যাপারে এই আইন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কম। একই দৃষ্টান্ত রয়েছে ব্লগারদের ক্ষেত্রে। বর্তমানে সোসাল মিডিয়াতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রশাসন এ ক্ষেত্রে কতটুকা সজাগ আমারা তা উপলদ্ধি করতে পারি। প্রশাসন কতোটুকু অসাম্প্রদায়িক ধারণা ধারন করে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। এ সময়ে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আমাদের মনে এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে। এমনকি রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠানে ধর্মের ব্যবহারের ক্রমাগত বৃদ্ধি উদ্বেগজনক।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে কার্যকর অর্থে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা খুব সহজসাধ্য নয়। এই কাজ স্বল্প সময়ে সম্ভবও নয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা জারি রাখার পরিবেশ যদি আমরা তৈরি করতে না পারি, তাহলে সামনের দিনে ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতির আলোকে রাষ্ট্র কাঠামোকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সামনে অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। সেটা কোনো একক উদ্যোগের ব্যাপার নয়, বরং তা একটি ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টার ফলে আনা যেতে পারে। এই ইস্যুতে আমাদের রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা হয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে। তার পথপরিক্রমা ও গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধিতে আনতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে একটি কার্যকর রাজনৈতিক ঐক্যের যেকোনো রকমের বিচ্যুতি আমাদের সেই উপলব্ধির পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই আমরা যারা আজ মুক্তিযুদ্ধের আকাংখায় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়তে চাই, তাদেরকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আগামীর কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অর্থপূর্ণ ভিত রচনা করতে হবে। এর বাইরে আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।